১৯৫০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান Saha Institute of Nuclear Physics (SINP).

(৪)

মেঘনাদ সাহা মাঝেমধ্যেই রসিকতার ছলে বলতেন, দেশের যে অংশে তাঁর জন্ম, সেখানে মানুষ হাঁটতে শেখার আগে সাঁতার শেখে। ফি বছর চারমাস জলে ডুবে থাকত তাঁর গ্রাম, ঢাকা জেলার শেওড়াতলি। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে কলকাতায় এসে ১৯১৩ সালে দেখলেন রাঢ়ভূমিতে দামোদরের দাপট। ১৯২৩–এ দেখলেন গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভয়াল বন্যার ধ্বংসলীলা। সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে সে বিপর্যয়ের মধ্যেই ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। সঙ্গী হলেন মেঘনাদ সাহা, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু। কালের নিয়মে একসময় সে বন্যার জল ধীরে ধীরে নেমে গেল। উত্তরবঙ্গ আবার সমৃদ্ধির পথে চলতে শুরু করল। কিন্তু সে বন্যা মেঘনাদের হৃদয়ে দু'টি গভীর দাগ রেখে গেল। এক, নদী পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণা শুরুর আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা। দুই, সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে তাঁর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধাবোধ। এই দু'টি দাগই পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্মধারাকে অনেকাংশে দিশা দেখিয়েছে। ১৯২৩–এর পর থেকেই মেঘনাদ নদী পরিকল্পনার দাবিতে সোচ্চার হলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কলম ধরে, বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে ভাষণের মধ্যে দিয়ে বারবার সরকারের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেন। তিনি জানতেন নদী পরিকল্পনার ফলে যে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে তাই নয়, জলাধারের জল সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে খরার বিরুদ্ধে লড়া যাবে, উৎপাদন করা যাবে জলবিদ্যুৎ। সরকারের উপেক্ষা সত্ত্বেও এ নিয়ে মেঘনাদ তাঁর লড়াই চালাতে থাকলেন। তারপর এল ১৯৪৩ সাল। আবার দামোদরের বান। ভেসে গেল রাঢ়ভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সাধারণ মানুষের ক্ষোভে গলা মেলালেন বর্ধমানের মহারাজাও। সরকারের টনক নড়ল। বর্ধমানের মহারাজকে সভাপতি রেখে তৈরি হল কমিটি। ডাক পড়ল মেঘনাদ সাহার। দামোদরের পাড় বরাবর কংক্রিটের বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হল। বরাদ্দ হল ৬ কোটি টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Tennessee Valley Authority (TVA) –র আদলে দামোদর উপত্যকার জন্য একটি স্থানীয় নিয়ন্ত্রক কমিটি গঠনের সুপারিশ জানালেন মেঘনাদ। সেই সুপারিশ মেনেই ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় Damodar Valley Corporation (DVC). মেঘনাদ সাহার একান্ত প্রচেষ্টায়TVA –র বরিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ভুরদুইনের হাতে দেওয়া হয় DVC –র পরিকল্পনার দায়িত্ব।

(৫)

ব্যক্তিগত জীবনে নাস্তিক হলেও মেঘনাদ সাহা ভারতীয় শাস্ত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন ভারতের বিভিন্ন সামাজিক কাজে পঞ্জিকার বহুল ব্যবহার অথচ পঞ্জিকার যাবতীয় গণনা হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো সূর্যসিদ্ধান্তের হিসাব অনুযায়ী। কিন্তু এই দেড় হাজার বছরে সূর্যের অয়নবিন্দুর চলন ঘটে গিয়েছে বেশ খানিকটা। কাজেই প্রাচীন মতে গণনা করতে গিয়ে পঞ্জিকায় রয়ে যাচ্ছে অনেকখানি ভুল। তা ছাড়া প্রাচীন গণনায় দিনের দৈর্ঘও সঠিক দৈর্ঘের চেয়ে প্রায় চব্বিশ মিনিট বেশি ধরা হয়। এই ভুল দিনের পর দিন জমতে জমতে বড় আকার নেয়, তার প্রভাব পড়ে ঋতু নির্ণয়ে। আর ভারতের মতো দেশে যেখানে চাষের দিনটি পর্যন্ত ঠিক করার আগে একবার পঞ্জিকায় চোখ বোলানো হয়, সে দেশে এই ত্রুটি কতখানি বিপজ্জক তা বোঝাই যায়।

মেঘনাদ উদ্যোগী হলেন এই ত্রুটি সংশোধন করতে। এ ব্যাপারে তিনি পাশে পেয়েছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক ও মদনমোহন মালব্যের মতো মানুষকেও। ভারত সরকার Calender Reformcs Committee গঠন করেন। মেঘনাদ সাহা সেই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হলেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের Posiotonal Astronomy Centre, প্রকাশ করতে শুরু করল আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গণনায় তৈরি 'দৃকসিদ্ধ' পঞ্জিকা। প্রাচীন পঞ্জিকা নিয়ে এই কাটাছেঁড়া ভারতের সমাজ যে খুব একটা ভালোভাবে নিল না, তা বলাই বাহুল্য। ফলটা এই যে, দৃকসিদ্ধ জন্ম নেওয়ার এতগুলো বছর পরেও হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া পঞ্জিকার বাজারে আজও প্রাচীনপন্থী গণনার আধিপত্য।

(৬)

একজন বিজ্ঞানী হিসাবে যতখানি আধুনিকমনস্ক হওয়া যায়, মেঘনাদ বোধহয় তার চেয়েও খানিক এগিয়ে ছিলেন। সমাজের সমস্যাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ব্যাপারেও তাঁর স্বকীয় মত ছিল। প্রায় গোটা দেশ তখন কংগ্রেসের সমর্থক। গান্ধীজি নিজে খাদি–খদ্দর ও কুটীরশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় গোটা দেশকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। মেঘনাদ এই স্রোতের বিপরীতে একাকী দাঁড়িয়ে রয়ে গেলেন খাদি–খদ্দর সংস্কৃতির একজন প্রধান সমালোচক হয়ে। একে তিনি প্রায়শই 'গরুর গাড়ির সংস্কৃতি' বলেও ব্যঙ্গ করতেন। সাহা নিজে কোনও দলীয় রাজনীতির পরিধি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তবে তাঁর নিজস্ব মত ছিল সুস্পষ্ট।

প্রথমত, মেঘনাদ ছিলেন ভারী শিল্পের সমর্থক। শুধু কুটীরশিল্প যে দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের মতো হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ কংগ্রেসিই তাঁর মতের বিরোধী ছিলেন।

১৯৩৮ সালে তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের শিল্পমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু একটি দেশলাই কারখানার উদ্বোধন করতে গিয়ে বললেন, 'এই দেশলাই কারখানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা বৃহৎ শিল্পায়নের পথে এক বিরাট পদক্ষেপের সূচনা করলাম।' এই বক্তব্যে মেঘনাদ গভীর আঘাত পেলেন। বুঝতে পারলেন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে যাঁরা শিল্পপ্রসার ও উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে চলেছেন তাঁদের নিজেদেরই ও বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নেই। এর ঠিক পরপরই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বৈঠকে নেহরুর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতান্তর হল। সরকার ও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের আর একটা কারণ ছিল শিক্ষানীতি। শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতার বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। মেঘনাদ মন থেকে বিশ্বাস করতেন দেশ চালাতে গেলে যতখানি নজর আইন শৃঙ্খলার দিকে দিতে হয়, ঠিক ততখানিই নজর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকেও দেওয়া উচিত।

(৭)

শিল্প আর শিক্ষানীতির পাশাপাশি নদী পরিকল্পনা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়েও মেঘনাদের সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রে শুধুমাত্র লেখালেখি বা বিজ্ঞানসভায় ভাষণ দিয়ে নিজের মতকে সরকারের কাছে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের ভিতরেও শরৎচন্দ্র বসুর মতো অনেকে মনে করতেন দেশ গঠনের স্বার্থে মেঘনাদ সাহার মতো বিদগ্ধজনের সংসদে আসাটা জরুরি। অথচ খাদি–খদ্দর–বিরোধী, স্পষ্টবাক মেঘনাদের পক্ষে কংগ্রেসের টিকিট পাওয়াটা অসম্ভব। শেষমেশ ১৯৫১ সালের নির্বাচনে বামপন্থীদের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হয়ে কলকাতা উত্তরকেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ালেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিংকা। একদিকে দেশে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের পালে প্রবল হাওয়া, অন্যদিকে রাজনীতির ময়দানে আনকোরা, স্পষ্টবাক এক বিজ্ঞানী। লড়াইটা সহজ ছিল না মোটেই। তবুও মেঘনাদ প্রায় ১৬ শতাংশ ব্যবধানে জিতলেন। এই হারকে কংগ্রেস সহজভাবে নিল না মোটেই। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু শ্লেষ ছুঁড়ে দিলেন, 'সাহার উচিত তার গবেষণাগারে ফিরে যাওয়া'।

তবে সাহা তো ফিরে যাওয়ার জন্য আসেননি। রামায়ণের মেঘনাদের মতো মেঘের আড়াল থেকে তিনি লড়াই করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর লড়াই খোলা মাঠে, বুক চিতিয়ে। সংসদে নিজের মত ও দাবিগুলি সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরতে শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ বা UGCর গঠনতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, বিজ্ঞান গবেষণার সংস্থা CSIR –এর কাজকর্মের ধারা কোন পথে গেলে দেশের কল্যাণ, শিক্ষাক্ষেত্রের এইরকম নানা বিষয়ে নিজের মতামত এইসময়ে তিনি সংসদে পেশ করেন। নিজে পূর্ববঙ্গের সন্তান হওয়ায় দেশভাগের যন্ত্রণা মেঘনাদের বুকের মধ্যেও বেজেছিল। তাই সরকারের উদ্বাস্তুনীতি যাতে যথেষ্ট মানবিক হয় সে ব্যাপারে তিনি আগাগোড়া চাপ সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

বাংলার বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল। মেঘনাদ সাহা সুবক্তা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মধ্যে থাকত শানিত যুক্তির তির। যে তিরে বিদ্ধ হয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরুও কখনও সখনও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে নেহরু ও মেঘনাদের মধ্যে এই মতের পার্থক্য কিন্তু পরস্পরের ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছাপ ফেলেনি। দু'জন দু'জনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি এতটুকুও। মতান্তর মানেই তো আর মনান্তর নয়।

১৯৫৬–র ১৬ ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রপতি ভবনে প্ল্যানিং কমিশনের এক মিটিংয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে বসে পড়লেন মেঘনাদ। ইতি পড়ল আজীবন চলে আসা এক অক্লান্ত সংগ্রামে।

(৮)

আসুন, পাততাড়ি গোটানোর আগে ছোট্ট একটি গল্প শোনাই। গল্পটি বহুশ্রুত, তবু ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগের কথা। মেঘনাদ সাহা তখন সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন। আয়নন তত্ত্ব ও অন্যান্য কাজের সুবাদে মেঘনাদ সাহা তখন একটি পরিচিত নাম। ঢাকা শহরের এক নামকরা উকিল এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এটা সেটা কথার পর উকিল ভদ্রলোক অধ্যাপক সাহার কাছে তাঁর কাজের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। মেঘনাদ সাহা যথাসাধ্য সহজভাবে গবেষণার কাজগুলি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন।

সে ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে শোনেন আর মাঝেমধ্যেই বলে ওঠেন, 'মশাই সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনি আর নতুন কী করলেন, এ সবই তো ব্যাদে আছে।' বেশ কয়েকবার এ কথা শোনার পর মেঘনাদ বিরক্ত হলেন। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই বেদের ঠিক কোন জায়গায় নক্ষত্রদের আয়ননের তত্ত্ব লেখা আছে আমায় একটু দেখাবেন?' অধ্যাপক সাহাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক শান্ত গলায় জানালেন, 'আমি তো ব্যাদ পড়ি নাই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আধুনিক বিজ্ঞানের যা কিছু আবিষ্কার, তা সব কিছুই ব্যাদে পাওয়া যাবে।' মেঘনাদ সাহা এ ঘটনায় এতখানিই চটেছিলেন যে শোনা যায় এরপর থেকে বিজ্ঞানের যে কোনও নতুন আবিষ্কার নিয়ে আলোচনার শেষে তিনি ব্যঙ্গ করে বলে উঠতেন, 'এ সব কিছুই ব্যাদে আছে।' তবে শুধু ব্যাঙ্গেই থেমে থাকেননি মেঘনাদ। 'ব্যাদে' সত্যিই বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু লেখা আছে কিনা তা জানতে খুঁটিয়ে পড়েছেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্র। আর তারপর বলেছেন, 'বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।'

দেশের বিজ্ঞান ও দেশের মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা আজ বড় অদ্ভুত এক সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। একসময় যে বিজ্ঞান কংগ্রেসে আলোচিত হত নক্ষত্রের অন্দরমহলের গূঢ় তত্ত্বের কথা সেখানে আজ অবলীলায় আলোচনা হয় পৌরাণিক যুগের মহাকাশযান নিয়ে। গণেশের মাথার প্লাস্টিক সার্জারি কে করল অথবা মহাভারতের যুগে সঞ্জয়ের বাড়িতে ইন্টারনেটের কানেকশন ছিল কিনা এই সমস্ত প্রশ্নে আজ আলোড়িত হয় দেশের সমাজ।

মাঝেমধ্যে মনে হয় আমরা বুঝি এক ভিড় বাসের যাত্রী। আর সে বাসের কন্ডাক্টর আমাদের কানে মন্ত্র ঢেলে দিয়েছে, 'পিছন দিকে এগিয়ে যান'। আমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছি পিছনের দিকে, এগিয়ে চলেছি অন্ধকারের দিকে। মেঘনাদ সাহার জীবন ও দর্শন কি সে অন্ধকার থেকে আমাদের আলোর দিশা দেখাতে পারবে? সে প্রশ্নের উত্তর বোধহয় বেদেও লেখা নেই!

একজন বিজ্ঞানী হিসাবে যতখানি আধুনিকমনস্ক হওয়া যায়, মেঘনাদ বোধহয় তার চেয়েও খানিক এগিয়ে ছিলেন। সমাজের সমস্যাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ব্যাপারেও তাঁর স্বকীয় মত ছিল। প্রায় গোটা দেশ তখন কংগ্রেসের সমর্থক

তথ্যসূত্র ঃ
১. মেঘনাদ সাহা ঃ জীবন ও সাধনা, সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
২. Current Science, 2016, 111(1), 217–218
৩. Phillosophical Magazine, 1920, 40, 472
৪. Nature, 1920, 105, 232–233
৫. ইন্টারনেট

প্রচ্ছদচিত্র ঃ শুভ্রদীপ চৌধুরী

sridharbanerjee91@gmail.com